হরিদাসের গুপ্তকথা

বাঙালি সমাজের চালচিত্র

হরিদাসের গুপ্তকথা

বাঙালি সমাজের চালচিত্র

আবুল আহসান চৌধুরী
সম্পাদিত

হরিদাসের গুপ্তকথা : বাঙালি সমাজের চালচিত্র
সম্পাদনা : আবুল আহসান চৌধুরী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম সংস্করণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

সম্পাদনা-স্বত্ব
আবুল আহসান চৌধুরী

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Haridaser Guptakatha: Bangali Samajer Chalchitra. Edited by Dr. Abul Ahsan Choudhury. Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Kobi Prokashani Edition: March 2021
Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka Rs: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95196-5-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

স ম্পা দ কে র উ ৎ স র্গ

আমাদের ছোটো-শহর কুষ্টিয়ার
চার দশকের সংস্কৃতিচর্চার প্রিয় মুখ
মুক্তিযুদ্ধের কালে
স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত
জল্লাদের দরবার-এর স্রষ্টা
নাট্যকার **কল্যাণ মিত্র** স্মরণে

নি বে দ ন

কালের বিচার বড়ো কঠিন, কখনো তা নির্মমও বটে। জীবনের প্রায়-সবক্ষেত্রেই একথা কমবেশি প্রযোজ্য। এখানে আমাদের বিবেচনা মূলত সারস্বত-কেন্দ্রিক।

সমকাল যাঁর সমাদর করে, উত্তরকাল হয়তো তাঁকে মনে রাখার গরজ বোধ করে না। আবার কখনো উলটোটাও ঘটতে দেখা যায়, সমকালের ঔদাসীন্যের ক্ষতিপূরণের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় উত্তরকালের অনুকূল সময়তক। বিচিত্র এই বিচার! এর সংগত, অদৃশ্য বা অবোধ্য কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে ক্রমাগত পেরেশানই হতে হয়। বাংলা সাহিত্যের এই মন্দভাগ্য বিস্মরণীয়দেরই একজন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬)। সাহিত্যভুবনের এই অনুচিত বিচারের দণ্ড সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে সেকালের সাহিত্য ও সংবাদ-সাময়িকপত্র-জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন : 'নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মতো সমানভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবু দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিল' (*নায়ক*, ২০ ভাদ্র ১৩২৩)।

দুই

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল ও সন্ধিৎসার একপর্যায়ে বহু-কাঙ্ক্ষিত ভুবনচন্দ্রের বই হাতে আসে। তার আগে তাঁর জীবনের নানা কর্মকৃতির সুলুক-সন্ধান পাই। ভুবনচন্দ্রের সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের নিবিড় সম্পর্ক ও তাঁর গ্রন্থের পরিমার্জনের খবর জেনে তাঁর প্রতি আগ্রহ আরো বাড়ে।

ভুবনচন্দ্রের *হরিদাসের গুপ্তকথা* পড়ে লেখক হিসেবে তাঁর প্রতি কিছু ধারণা জন্মায় এবং তাঁর সমাজমনের পরিচয়-লাভের সুযোগও ঘটে। বলা হয়েছে, এ-বই ইংরেজি একটি বইয়ের তরজমা। কিন্তু বইটি পড়ে কখনো মনে হয়নি এটি অনুবাদের ফসল— হতে পারে এটি স্বাধীন-অনুবাদ স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন-সাধন করে, বা লেখক হয়তো

কথিত ইংরেজি বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাহিনি পরিবেশন করে থাকবেন। যাই-ই হোক না কেন, লেখক হিসেবে তা ভুবনচন্দ্রের সাফল্যের পরিচয়ই দেয়। তাঁর নৈপুণ্যের আরো দুটি পরিচয় নির্দেশ করা যায়– গদ্যরীতি ও সমাজচিত্র। আগাগোড়া কথ্য-ভাষাভঙ্গি অনুসরণ করেছেন, বানান-রীতিতেও কিছু স্বাতন্ত্র্য বা বৈচিত্র্য আছে। ভাষারীতি সম্পর্কে গ্রন্থের সূচনাতেই লেখক হরিদাসের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন : 'জীবনকাহিনীগুলি প্রণালীপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে হইলে এতদ্দেশের প্রচলিত কথোপকথনের সহজ ভাষাই ব্যবহার করা ভাল; কেন না, সেই ভাষায় গল্পচ্ছলে লিখিয়া দিলে আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হয়। এই আখ্যায়িকাতে সেই ভাষাই আমি অবলম্বন করিব।'

তিন

নকশাধর্মী এই উপাখ্যানে অবক্ষয়িত সমাজ ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের কিছু ছবি ফুটে উঠেছে– সময়-ব্যক্তি-অঞ্চলের আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ও অস্পষ্ট নয়। বহির্বঙ্গে ভ্রমণরত অবস্থায় ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গেও মূলত শ্রুতিসূত্রে হরিদাসের কিছু পরিচয় হয়– অর্জিত হয় সামান্য অভিজ্ঞতাও। বিদ্রোহের প্রতি তাঁর কোনো ঝুঁকিহীন মৌন-সমর্থনও ছিল না, তবে কোম্পানি বাহাদুর বা ইংলন্ডেশ্বরীর প্রতি অচলা-ভক্তি-সহানুভূতির অভাব হয়নি।

হরিদাসের গুপ্তকথায় ভুবনচন্দ্রের নিজের যে-ছায়া আছে, তাঁর মন-মতের প্রতিফলন ঘটেছে, তা হয়তো ভাবা যায়। উনিশ শতকের কলকাতার বেশ্যা-বাইজি-নেশা-ব্যভিচার-অমিতাচার-সাহেবসাজার পরিচয় দুর্লভ নয়। আধুনিক শিক্ষা, সংস্কারপন্থি সভা-সমিতি ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তাঁর দ্বেষ ও বিরূপতা গুপ্ত থাকেনি। 'হরিদাস' ওরফে প্রচ্ছন্ন-ভুবনচন্দ্র রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ ছিলেন– ধর্মীয় বিচারে ছিলেন অপরিবর্তনীয় আদর্শে বিশ্বাসী ঘোর-সনাতনপন্থি। প্রগতিবিরোধী শুধু নন, তিনি কালবিরোধীও ছিলেন– তাই গৌরবের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারেন : 'বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহের বিরোধী আমি নই– সে-কারণেই ... নবমবর্ষীয়া অমলকুমারীকে [কন্যা] আমি যোগ্যপাত্রে সমর্পণ কোল্লেম'।

বিদ্যালয়-স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা বা জনহিতকারী কোনো কাজে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই– এসব কাজে বা স্বাধীন ব্যবসায়ে যারা উদ্যোগী তিনি তাদের সমালোচনায় মুখর– তিনি উৎসাহী দেবালয়-নির্মাণে এবং বাঙালি হিন্দুর ম্লেচ্ছাচারেই 'পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম– আর্য্যসমাজ'-এর ক্ষয় ও অবনতি– এই তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনি মহামুক্তির অন্বেষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন : 'বঙ্গদেশে আমার মত

লোকের আর শান্তি নাই, মুক্তিক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে প্রস্থান কোরে পরমার্থচিন্তায় কালহরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ’।

এ-থেকে বেশ বোঝা যায়, উনিশ শতকের নানা সংস্কার-আন্দোলন, উদার সমাজদৃষ্টি, ইহজাগতিকতা হরিদাস বা তার স্রষ্টাকে প্রাণিত-আলোড়িত-উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। এ-গৌরবের কথা নয় বটে, তবে সত্য কথা– এই সত্য-স্বীকারে ভুবনচন্দ্র কুণ্ঠিত ছিলেন না।

চার

গ্রন্থভুক্ত এই লেখাটি প্রথমে ঢাকার দৈনিক *প্রথম আলোর* ২০১০-এর ঈদসংখ্যায় ছাপা হয়, পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান ও ঈদসংখ্যা-সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরিফের সৌজন্যে। সেই সময়ে লেখাটি পাঠকের মনোযোগ লাভ করে এবং কেউ কেউ বই হিসেবে প্রকাশের পরামর্শ দেন। এর প্রায় এক যুগ পরে কবি প্রকাশনীর সাহিত্যমনস্ক স্বত্বাধিকারী সজল আহমেদের উদ্যোগে তা ফলপ্রসূ হয়। গ্রন্থ-প্রকাশে আন্তরিক সহায়তার জন্যে স্মরণ করি কবি-প্রাবন্ধিক পিয়াস মজিদ, প্রচ্ছদশিল্পী সব্যসাচী হাজরা, কর্মসহকারী মোঃ ফারুক হোসেন ও আরো কারো-কারো নাম।

পুরোনোকালের একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের ঘরে-বাইরের যে-বিচিত্র ছবি প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দবোধ করছি।

আবুল আহসান চৌধুরী

মজমপুর
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
(০০-৮৮)-০১৭১১-৯৫৪৭১৮

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ১৩
হরিদাসের গুপ্তকথা ২৫

ভূ মি কা

বাঙালির গুপ্তকথার অন্ত নেই। পতিত-পতিতার গুপ্তকথা, পির-মোহন্তের গুপ্তকথা, ভাসুর-ভাদ্রবধূর গুপ্তকথা, জামাই-শাশুড়ির গুপ্তকথা, নফর-মালকিনের গুপ্তকথা, বাবু-বিবির গুপ্তকথা– এ-সব কেচ্ছা সবই যে বানানো তা নয়। কখনো কখনো নিজের অভিজ্ঞতা– বাস্তব ঘটনার সঙ্গে উদার কল্পনার মিশেলে গড়ে ওঠে এই কাহিনি। আবার কখনো বা কোনো সমকালীন ঘটনার কথাও উঠে আসে আখ্যায়িকা বা নকশাধর্মী রচনায়। গল্পের এইসব কাঁচামাল নিয়ে কাহিনি-নির্মাণের কারবারের কিছু খলিফা-মসিজীবী উনিশ শতকে বেশ রমরমা ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন ফরমায়েশি লেখক– আবার দু-চারজন জাত-লেখকও এই কাজে হাত পাকিয়েছিলেন। আদিরসের এইসব কেচ্ছা-কাহিনির জন্মস্থানের নাম 'বটতলা'। ঝাঁকা-মুটের দল 'পাস করা মাগ', 'বেশ্যারহস্য', 'কমলিনীর মধুচাক', 'ছোট বউর বোম্বাচাক', 'রমণীরঞ্জন', 'সচিত্র রতিশাস্ত্র', 'শাশুড়ি-জামাই', 'গুণের শ্বশুর', 'রাতে উপুড় দিনে চিৎ; ছোট বউর এ কি রীত' এবং এরসঙ্গে গুপ্তকথার কেচ্ছার কেতাব মাথায় তুলে ফিরি করে বেড়াতো– রসিকজনেরা কখনো এর কদর করতে ভোলেননি।

দুই

সেকালে বটতলায় জানা-অজানা অনেক বাজারি-লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। কেউ কেউ নামও কিনেছিলেন বেশ। এঁদের বইয়ের বিক্রি-বাট্টা যে মন্দ ছিল না, তা বেশ বোঝা যায় সংস্করণের হিসেবে। ওই যে বলেছি, দু-একজন মেধাবী লেখকও ভিড়েছিলেন বটতলার লেখকের দলে– এঁদেরই একজন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬)– 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১৩১০/১৯০৪) তাঁরই লেখা বই।

ভুবনচন্দ্র জন্মেছিলেন চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বারুইপুরের কাছে শাসন গ্রামে, সেকালের রেওয়াজ অনুসারে মায়ের বাপের বাড়িতে। মূলত অভাবের কারণেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। তাই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সামান্য কিছুদিন স্কুল-মাস্টারি আর গৃহশিক্ষকতার কাজ করেন। এরপর তাঁর জীবন কেটেছে সাহিত্যচর্চা আর সাংবাদিকতায়। তিনি 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ' ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

এ-ছাড়া 'বিদূষক', 'পূর্ণশশী', 'বসুমতী' ও 'জন্মভূমি' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। তাঁকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা চলে। জানা যায় : 'তিনি কাব্য, গল্প-উপন্যাস, সামাজিক নক্‌শা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী– এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগেই কিছু না কিছু লিখিয়াছেন' ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৮ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৫৮)। তাঁর কাব্য-কবিতার মধ্যে আছে 'মধু-বিলাপ' (১৮৭৩), 'আমি রমণী' (১৮৮১), 'তুমি কে?' (১৮৮৭)। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস বা 'নবন্যাস'ও লিখেছেন : 'তুমি কি আমার?' (১৮৭৩-৭৯), 'রহস্য-মুকুর' (১৮৭৭-৭৮), 'ছোট বউ' (১৮৮৫), 'আমার মহিষী' (১৮৮৭), 'কুঞ্জবালা' (১৮৯০), 'কমলকুমারী ও রাজা সন্ন্যাসী' (১৮৯১), 'পারুল বা সেই কি তুমি?' (১৮৯৩), 'অগ্নিকুমারী' (১৮৯৪), 'আনন্দ-লহরী' (১৮৯৪), 'আমিনা বাই' (১৯০২), 'বাবু-চোর' (১৯০৬), 'সংসার-সাগর' (১৯১২), 'প্রেমের বাজার' (১৯১২), 'বিলাতী ভূত' (১৯১৫), 'জেলখানা' (১৯১৯)। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গোয়েন্দা-আখ্যান রচনা করেন : 'মার্কিন পুলিস কমিশনার' (১৮৯৬), 'গুপ্তচর' (১৮৯৮), 'ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর' (১৯০০), 'চন্দ্রমুখী' (১৯০২), 'সন্তপ্ত সয়তান' (১৯০৩-০৪), 'লণ্ডনরহস্য' (১৯১২-১৪), 'রাণী ইউজিনীর বৈঠক' (১৯২৪)। দীনেন্দ্রকুমার রায়কে গোয়েন্দা-কাহিনি অনুবাদে ভুবনচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরি বলা যায়। ভুবনচন্দ্রের আদর্শে দীনেন্দ্রকুমারও বিদেশি গোয়েন্দা-কাহিনি বাংলায় অনুবাদে হাত দেন এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। যাই হোক, অনুবাদে ভুবনচন্দ্রের ভালো হাত ছিল। বোধকরি ভুবনচন্দ্রই প্রথম বাংলায় স্যার জোনাথন সুইফ্‌ট-এর বিখ্যাত 'গালিভার্স ট্রাভলস্'-এর অনুবাদ করেন 'রজতকুমারী' (১৯০২) নাম দিয়ে। বইটি পরের বছর আবার চার খণ্ডে 'আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত কয়েকখানা প্রহসনের নামও পাওয়া যায় : 'মা এয়েচেন!!!' (১৮৭৩), 'পাঁচ পাগলের ঘর' (১৮৮০), 'ঠাকুরপো' (১৮৮৬)। রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনাতেও তাঁর মতি ছিল, 'মহাদেবের মাদুলী' তার দৃষ্টান্ত। ভুবনচন্দ্রের ভিন্ন ধরনের কিছু গদ্যরচনার সন্ধানও পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী লিখেছেন ('রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত', ১৯০১)। বৃহৎ কলেবরে 'সিপাহী-বিদ্রোহ বা মিউটিনী'-র ইতিহাস লিখেছেন (১৯০৭)। তাঁর 'স্বদেশবিলাস' সন্দর্ভ প্রকাশ পায় ১৮৯৩-এ। নামকরণ থেকে অনুমান হয় বইটিতে স্বদেশ সম্পর্কে হয়তো নানা কথা আছে– আবার পাশাপাশি শখের স্বদেশোদ্ধারকারীদের প্রতি কিছু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও থাকতে পারে। নকশা-রচনাতেও ভুবনচন্দ্রের আগ্রহের কমতি ছিল না। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের উদার আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। উড়নচণ্ডী ভুবনচন্দ্রকে কালীপ্রসন্ন কিছুকালের জন্যে আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ১ম খণ্ড

প্রকাশের মোটামুটি দুই বছর পর ভুবনচন্দ্র 'হুতোমে'র অনুসরণে 'সমাজ কুচিত্র' নামে একটি নকশা রচনা করেন এবং তা 'অনরেবল হুতোম'কেই উৎসর্গ করেন। জানা যায়, 'হুতোম'রূপী কালীপ্রসন্ন নিজেও 'সমাজ কুচিত্রে'র প্রশংসা করেছিলেন। আরো নকশা লিখেছিলেন ভুবনচন্দ্র, যেমন– 'যাত্রা-বিলাস' ('বঙ্গের যাত্রার আসরের নক্সা', ১৮৮৭), 'ধর্ম্মরাজ' (১৯০১), 'বঙ্গরহস্য' (১৯০৪) প্রভৃতি। এ-ছাড়া তাঁর বইয়ের বিজ্ঞপ্তি থেকে আরো প্রায় কুড়িটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

তিন

এবারে 'গুপ্তকথা'র প্রসঙ্গে আসি। বাজার-কাটতিতে 'গুপ্তকথা' নামের একটা বেশ আকর্ষণ ছিল। তাই 'গুপ্তকথা' নাম দিয়ে ভুবনচন্দ্র বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, যেমন– 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!!' (১৮৭০-৭৩), 'রহস্য-মুকুর আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!' (১৮৭৭-৭৮), 'বিলাতী গুপ্তকথা' (১৮৮৮-৮৯), 'বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা' (১৮৯০), 'আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!' (১৯০৪), 'রাজা আদিত্যনারায়ণের গুপ্তকথা'। এখানে বলে রাখি, পরে ভিন-লেখকের 'হরিদাসীর গুপ্তকথা' নামেও বই বেরিয়েছিল।

ভুবনচন্দ্রের কৃতি সম্পর্কে আজকের বাঙালি পাঠকের প্রায় কিছুই জানা নেই। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রকৃত লেখক কে এমন বিতর্ক একসময়ে উঠেছিল, তখন কেউ কেউ রায় দিয়েছিলেন ভুবনচন্দ্রের পক্ষে। সুকুমার সেন নানা কারণে সন্দেহ করেছেন, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র রচয়িতা ভুবনচন্দ্রই। অবশ্য তাঁর এই মত সমর্থিত হয়নি। আবার প্রায়-অকালমৃত মধুসূদনের 'মায়াকানন' নাটকের অসম্পূর্ণ শেষ-অঙ্কটি লেখার দায় ভুবনচন্দ্রের ওপরেই বর্তেছিল। প্রিয় পাঠক, আরো মনে করিয়ে দিই, এই ভুবনচন্দ্রই মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) 'বসন্তকুমারী নাটক' ও 'বিষাদ-সিন্ধু'র পাণ্ডুলিপি 'উত্তমরূপে সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সুসজ্জিত করেন' ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৮ম খণ্ড)। ভুবনচন্দ্রের বইয়ের বিজ্ঞাপন (১৮৮৭) থেকে জানা যায়, তিনি এক টাকা মূল্যের 'মহরম' নামে একটি বই লিখেছিলেন। অনুমান করতে বাধা নেই যে, হয়তো 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রেরণাতেই তিনি এই বইটি লিখেছিলেন। আবার গৌরী নদীর উৎপত্তির কিংবদন্তি দু'জনই পরিবেশন করেছেন– আগে মশাররফ, পরে ভুবনচন্দ্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ভুবনচন্দ্রের অবদান প্রসঙ্গে যে-মন্তব্য করেছিলেন তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে কয়জন ভগীরথ... [অনুবাদ-অনুসরণের] প্রবাহ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, ভুবনচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী ও প্রধান। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী বাঙালীকে অনেক বৈদেশিক গল্প একান্ত দেশী রূপ দিয়া শুনাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রকাশ্য সাহিত্য-সাধনার আমরা

খবর রাখি; কিন্তু গুপ্তকথা ও রহস্য-গল্পের বিপুল গোপন ধারা আমাদের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে। যাহা এককালে আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজকে ও অন্তঃপুরকে মাতাইয়াছিল, কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা আজ বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এগুলির সাহায্যে আমাদের মাতৃভাষা যে পুষ্ট হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে আমাদের প্রত্যবায় হইবে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা মধুসূদন-কালীপ্রসন্ন সিংহের উত্তর-সাধক রহস্যোপন্যাসের রাজা ভুবনচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম' ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৮ম খণ্ড)।

চার

'হরিদাসের গুপ্তকথা' ভুবনচন্দ্রের সাড়া-জাগানো উপাখ্যান। তাঁর 'ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরে'র (১ম খণ্ড, ১৯০০) ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন : 'ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র জন্ম। সেই রহস্যোপন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফুল– প্রথম ফল।' কিন্তু তাঁর পুস্তক-প্রকাশের বিবরণে দেখা যায়, এর পাঁচ বছর আগে (১৮৬৫) প্রকাশিত 'সমাজ কুচিত্র'ই তাঁর প্রথম বই। এ-থেকে ধারণা করা যায়, 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আগে লেখা হলেও হয়তো কোনো কারণে পরে প্রকাশ পায়। আর সেই প্রথম প্রকাশকালে 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!' নামে বইটি প্রকাশিত হয়। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নামে বই বের হয় আরো অনেক পরে, ১৯০৪ সালে। এখানেও গ্রন্থনামের আগে উল্লেখ করা হয়েছিল– 'আর এক নতুন!' আর শেষে 'অতি আশ্চর্য্য!!!'– এই কথাটি। তবে 'আমার গুপ্তকথা'র গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রে জানা যায় : ৮৭০ পৃষ্ঠার বইটি রচিত হয় 'রেনল্ডসের Joseph Wilmotএর ছায়াবলম্বনে। 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র ... গোড়ার পর্ব্ব ও আদিরূপ ১৮৭০ সনের ডিসেম্বরে সংখ্যানুক্রমে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৭৩ সনের বসন্তকালে সমাপ্ত হয়' ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৮ম খণ্ড)। ৩৪ বছর পরে (ফাল্গুন ১৩১০/১৯০৪) এই বইটিই 'আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!' নামে 'নবন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন অবশ্য গ্রন্থের কলেবর নেমে আসে ৬৪৪ পৃষ্ঠায়। চার খণ্ডে সম্পন্ন এই বই সম্পর্কে বলা হয় : 'নূতন লিখিত– আধুনিক বঙ্গের সমাজচিত্র'। লেখক তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেন : 'ইহার আদ্যোপান্ত নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত; সমস্তই নূতন, সর্ব্বাংশেই নূতন, সম্পূর্ণরূপেই নূতন'।

পাঁচ

'হরিদাসের গুপ্তকথা'র প্রকৃত লেখক কে তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ভুবনচন্দ্রের বইয়ের

তালিকায় 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র প্রথম ও উত্তরকালের লেখক হিসেবে ভুবনচন্দ্রের নামই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রচয়িতা হিসেবে কলকাতার শোভাবাজারের রাজকুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামও এসে যায়। এই বইয়ের প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় প্রকাশক শোভাবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু বলেছিলেন : 'কলিকাতা শোভাবাজারের রাজকুল-কিশোর স্বজাতীয় কাব্যসাহিত্যের অকপট অকৃত্রিম মিত্র, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপাখ্যানের স্থূল গ্রন্থি, স্থূল মর্ম্ম, স্থূল বৃত্তান্ত এবং স্থূল স্থূল সমস্ত আখ্যানকাণ্ড আখ্যান করেন। তাঁহার উপদেশে, তাঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে, তাঁহার অকৃত্রিম পরম মিত্র সংবাদ প্রভাকর পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত অলঙ্কারাদি যোগে উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের নামে (আর এই আখ্যানের অঙ্গীভূত যা কিছু থাকা সম্ভব, উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের সহায়ে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, উত্তেজনায় আর মনোনিবেশে) এই আখ্যানটি রচনা করেন।' খানিকটা উকিলি-ভাষায় প্রকাশক মহোদয় তাঁর বক্তব্য পেশ করলেও এর লেখক যে ভুবনচন্দ্র তা অস্বীকার করতে পারেননি। সাহিত্যানুরাগী উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন, এমন খবর জানা না গেলেও তাঁর নামে একটি উপন্যাস 'রত্নগিরি– আশা প্রতীক্ষা' (তিন খণ্ড, ১২৮৮-৯০) প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেকালে রাজা-রাজড়া, জমিদার-বিত্তবানেরা অর্থের বিনিময়ে লেখকদের দিয়ে পারিবারিক ইতিহাস, পূর্বপুরুষ বা নিজের জীবনী লিখিয়েও প্রকাশ করতেন। পরান্নে পরাশ্রয়ে পালিত অভাবী ভুবনচন্দ্রও হয়তো সেইরকম ভূমিকাই পালন করেছিলেন। নইলে ইংরিজি-জানা ভুবনচন্দ্র রেনল্ডস্-এর বই পড়ে নিজে বুঝতে না পেরে উপেন্দ্রকৃষ্ণের সহায়তা নেবেন , তা বিশ্বাস করা কঠিন। পরে ১৯০৬ সালে 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!!! অতি আশ্চর্য্য!!!' বইটি উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর দুই বছর আগে ভুবনচন্দ্রের 'আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!' বইটি সম্পূর্ণ নতুন কলেবরে প্রকাশ লাভ করে। 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!!' বইয়ের প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় প্রকাশক বলেছিলেন, ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণের 'নামে' 'এই আখ্যানটি রচনা করেন'। কিন্তু দ্বাদশ সংস্করণে (১৯০৬) প্রকাশক মহোদয় উল্লেখ করেছেন : '... শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর এতৎ উপন্যাসের একমাত্র প্রণেতা,– তিনিই এই রহস্যোপন্যাসটি বিরচন করেন...।' প্রকাশকের একই প্রসঙ্গে দুই ধরনের উক্তিতে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। এ-নিয়ে ভুবনচন্দ্র ও উপেন্দ্রকৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। কিভাবে এই বিবাদের নিরসন হয় তা জানা যায় না। তবে পরেও ভুবনচন্দ্রই যে 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র লেখক তা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দুইজনে মিলেই এই 'রহস্যোপন্যাস'-টি লিখেছিলেন, একা ভুবনচন্দ্র লেখেননি' ('বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি', কলকাতা, ২০০২)– রমাকান্ত চক্রবর্তীর

এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ভুবনচন্দ্র বা উপেন্দ্রকৃষ্ণ কারো বক্তব্যেই এই কথার সমর্থন মেলে না। ভুবনচন্দ্র তাঁর 'ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর' (১ম খণ্ড, ১৯০০) বইয়ের ভূমিকায় স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন : 'ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র জন্ম। সেই রহস্যোপন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফুল– প্রথম ফল।'

এই লেখক-বিতর্ক নিয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার ভেতর দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১০৯ বর্ষ ১-২ সংখ্যা : ১৪০৯)। রামকৃষ্ণ যুক্তি-তর্ক দিয়ে বলতে ও বোঝাতে চেয়েছেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবই 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!' বইটির লেখক। উপেন্দ্রকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি ভুবনচন্দ্রকে খাটো করেছেন এবং কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেও ছাড়েননি। এমন কী ভুবনচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি কিংবা সমকালীন খ্যাতিকেও খারিজ করতে চেয়েছেন। উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এবং ভুবনচন্দ্র সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তবে 'হরিদাসে'র জনক হিসেবে সুকুমার সেন কিংবা শ্রীপান্থ-র ('বটতলা', কলকাতা, ১৯৯৭) স্বীকৃতি ভুবনচন্দ্রই লাভ করেছেন। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র পরিসরে আলোচনার ইচ্ছে রইলো। তবে এ-কথা ঠিক যে, পাঠক এ-দু'জনের কাউকেই মনে রাখেননি, তবে সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় উপেন্দ্রকৃষ্ণ নন, ভুবনচন্দ্রই স্থান পেয়েছেন। শুধু স্মরণ করতে বলি, ভুবনচন্দ্রের মৃত্যুর পর সাহিত্যিক-সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগী ভাষার কথাগুলো : 'একটা কথা সাহিত্য-পরিষদ্, সাহিত্যসভা প্রভৃতি মোড়লদের জিজ্ঞাসা করিব, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মরিয়াছেন, তোমাদের সে খবর আছে কি? আলালের সময় হইতে যিনি বাঙ্গালার গদ্যপদ্য লেখক, মাইকেলের সহচর, যাঁহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না, যাঁহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না– সেই সরল, সোজা, দেশী বাঙ্গালা গদ্যের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক বাঙ্গালায় আর ছিল না– বোধ হয় আর হইবে না। আর ... তুমি ভুবনচন্দ্রের মনীষা বেচিয়া এত অর্থ পাইয়াছ, তুমি সেই বুড়ার মরণে কি করিলে? কি করিবে? নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মত সমানভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবু দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিল' ('নায়ক', ২০ ভাদ্র ১৩২৩)।

ছয়

'হরিদাসের গুপ্তকথা' চার খণ্ডে বিভক্ত। অধ্যায় এখানে 'কল্প' নামে নির্দেশিত। প্রথম খণ্ডে উনিশ, দ্বিতীয় খণ্ডে নয়, তৃতীয় কণ্ডে বারো এবং চতুর্থ খণ্ডে একটি

'কল্প' বা অধ্যায় ও সেইসঙ্গে উপসংহার সংযোজিত হয়েছে। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' লণ্ডন-বটতলার জনপ্রিয় লেখক জর্জ উইলিয়ম ম্যাকআর্থার রেনল্ডস্-এর Joseph Wilmot-এর 'ছায়াবলম্বনে' রচিত বলা হয়। রেনল্ডস্ আমাদের বটতলার লেখকদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। রেনল্ডস্-এর বইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তাই তুলনা করার সুযোগ নেই, সে-কারণে বলা মুশ্‌কিল অনুবাদ বা ঋণ-গ্রহণের ধরনটা কেমন ছিল। তবে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' পড়লে কাহিনি-উৎস জানা না থাকলে এটি কোনো বিদেশি বইয়ের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ বা ছায়ানুবাদ– এ কথা আদৌ মনে হয় না। হয়তো কাহিনির কাঠামোগত কোনো ধারণা লেখক এই ইংরেজি বই থেকে নিয়েছিলেন। সামান্য ব্যতিক্রম বাদে এই কাহিনির স্থান-কাল-পাত্র যে নিরঙ্কুশ বঙ্গদেশীয় তাতে কোনোই সংশয় নেই। এখানে ইংরেজ লেখকের বইয়ের উল্লেখ হয়তো পাঠকের আগ্রহ উসকে দেওয়ার কৌশল মাত্র– পাঠককে আকৃষ্ট করার সূক্ষ্ম ফন্দি। তবে 'গুপ্তকথা'র গুণের দিক বিচার করলে দেখা যাবে, সমাজের ছবি কাহিনি-পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে আর আগাগোড়া চলতি গদ্যে ঠাসবুনুনি কাহিনি পাঠককে ধরে রাখে– তাঁর কৌতূহলকে বিশ্রাম দেয় না।

কেউ কেউ 'হরিদাস' নামটি যে বাঙালি সমাজে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয় সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেইদিক বিবেচনা করলে– 'হরিদাস' নামের যেমন কোনো গৌরব বা মহিমা নেই, তেমনি তার কাহিনিরও। কথাটি যে অযৌক্তিক নয় তার সমর্থনে প্রচলিত একটি ছোটোমতো প্রবচনতুল্য ছড়ার উল্লেখ যথেষ্ট। এখানে হরিদাস হয়ে যায় 'হরিদাস পাল', আর তার আগের পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত অন্ত্যমিলের শব্দটি কেবল তাচ্ছিল্যসূচক নয়, উচ্চারণ-অযোগ্যও বটে। তবে আমাদের এই কাহিনির হরিদাস তার অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি-দর্শনের ভেতর দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধারণা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে তাকে তুচ্ছ বা মূল্যহীন মনে করার কোনো কারণ নেই। সেই নিরিখে তার বিবরণ তাই হয়ে উঠেছে 'আধুনিক বঙ্গের সমাজচিত্র'।

সাত

'হরিদাসের গুপ্তকথা' সেকালের সাড়া-জাগানো বই। ভুবনচন্দ্র, না উপেন্দ্রকৃষ্ণ– এই লেখক-বিতর্ক বইটির প্রচারে সহায়তা করেছিল– এমন ধারণা হয়তো অসংগত নয়। লেখক বইটিকে 'নবন্যাস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের উপকরণ কিছু থাকলেও পুরোপুরি একে উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা যায় না। ভ্রমণচিত্র, নকশা, আত্মকথা ও উপন্যাসের মিশ্র রূপের সংকর-সৃষ্টি 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। নামকরণে 'গুপ্তকথা' শব্দটি যুক্ত হলেও এতে এমন কোনো ঘটনা বা বিবরণ নেই যাতে নামকরণের সার্থকতা বা যথার্থতা নিরূপণ করা চলে। এ-ও

পাঠককে প্রলুব্ধ করার একটা কৌশল মাত্র। এ-বইয়ের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা সমাজচিত্র, উনিশ শতকের অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস এবং অনবদ্য কথ্য-বাংলায় লেখা বই হিসেবে।

এক ভাগ্য-বিড়ম্বিত নিরাসক্ত উদাসীন মানুষ হরিদাসকে কেন্দ্র করেই মোটের উপর এই উপাখ্যানের কাহিনি আবর্তিত। হরিদাসের বিবৃতিতে কাহিনি এগিয়ে চলে সহজ-সরলভাবেই– ক্বচিৎ কোনো নাটকীয়তা কিংবা রোমাঞ্চ-রহস্য কাহিনিকে জমিয়ে তোলে। হরিদাস চলতি-পথে যা দেখেছে তারই বিবরণ স্থান পায় এখানে। ভ্রমণকারী হরিদাস কেবল বাংলা মুলুকে নয়, বাংলার বাইরেও নানা জায়গায় গেছে। বাংলার কলকাতা, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ত্রিপুরা ও আরো কোনো কোনো জায়গায় আর সেইসঙ্গে বাংলার বাইরে আসামের কামরূপ-কামাখ্যা, পাটনা, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, গুজরাট– এ-সব নানা জায়গায় তাকে যেতে হয়েছে। তার অনুসন্ধিৎসা, অনুমান ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করতে হয়– দু'চোখ মেলে সে দেখেছে এ-সব অঞ্চলের জনজীবনের ছবি। গুণ্ডা, ডাকাত, তস্কর, ঠগ, ভণ্ড, প্রতারক, বেশ্যা, বাইজি, কুলটা– নানা কিসিমের মানুষকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। হরিদাস দেখেছে মুখ ও মুখোশের স্বরূপ– অনাচার, ব্যভিচার, অবিচার, অমানবিকতা, শঠতা, তঞ্চকতার কতো রকমফের। মানবচরিত্র যে কতো বিচিত্র– সেই বিষয়টি জানার সুযোগও মিলেছে তার।

হরিদাসের কলকাতার অভিজ্ঞতার সামান্য ইঙ্গিত আগে এখানে দিয়ে নিই। উনিশ শতকে কলকাতা ছিল বেশ্যা-বাইজি-খানকি-খেমটার শহর। ছ'মাস কলকাতায় থাকার পর চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হয় হরিদাসের। তার মুখেই শোনা যাক সেই বৃত্তান্ত : '... কোজাগর-পূর্ণিমার দিন বৈকালে আমি একাকী চিৎপুর রোডে বেড়াতে বেরিয়েছিলেম। ... গরাণহাটা থেকে কলুটোলা-রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেম, দুধারি বারান্দায় বারান্দায় রকমারি মেয়েমানুষ। রকমারি বর্ণের কাপড়পরা, রকমারি ধাতুর গহনাপরা, রকমারি ধরনের খোঁপাবাঁধা, অনেক রকম মেয়েমানুষ। কেহ কেহ টুলের উপর বোসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বোসেছে, কেহ কেহ রেলিঙের উপর বুক রেখে ভানুমতী-ধরনের মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে ঝুলছে; কারো বুকে রঙদার কাঁচুলী, কারো কারো মুখে রংমাখা, কারো খোঁপা নাই, পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবেণী, কেহ কেহ এলোকেশী। কারা এরা? লোকমুখে শুনেছিলেম, কলিকাতা সহরে বেশ্যা অনেক; যে সকল পণ্ডিত সাধুভাষায় কথা কন, তাঁরা বলেন, বেশ্যা মানে নগরবিলাসিনী বারাঙ্গনা; সুখবিলাসী মতিচ্ছন্ন যুবাদলের ইহকাল পরকাল ভক্ষণ করে। ... চিৎপুর রোড এই সকল ফাঁদে আচ্ছন্ন। ... কলিকাতার বেশ্যানিবাসের প্রণালীটী অতি জঘন্য। গৃহস্থের বাড়ীর কাছে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, ডাক্তার-কবিরাজের আবাসের পাশে বেশ্যা, কোথাও